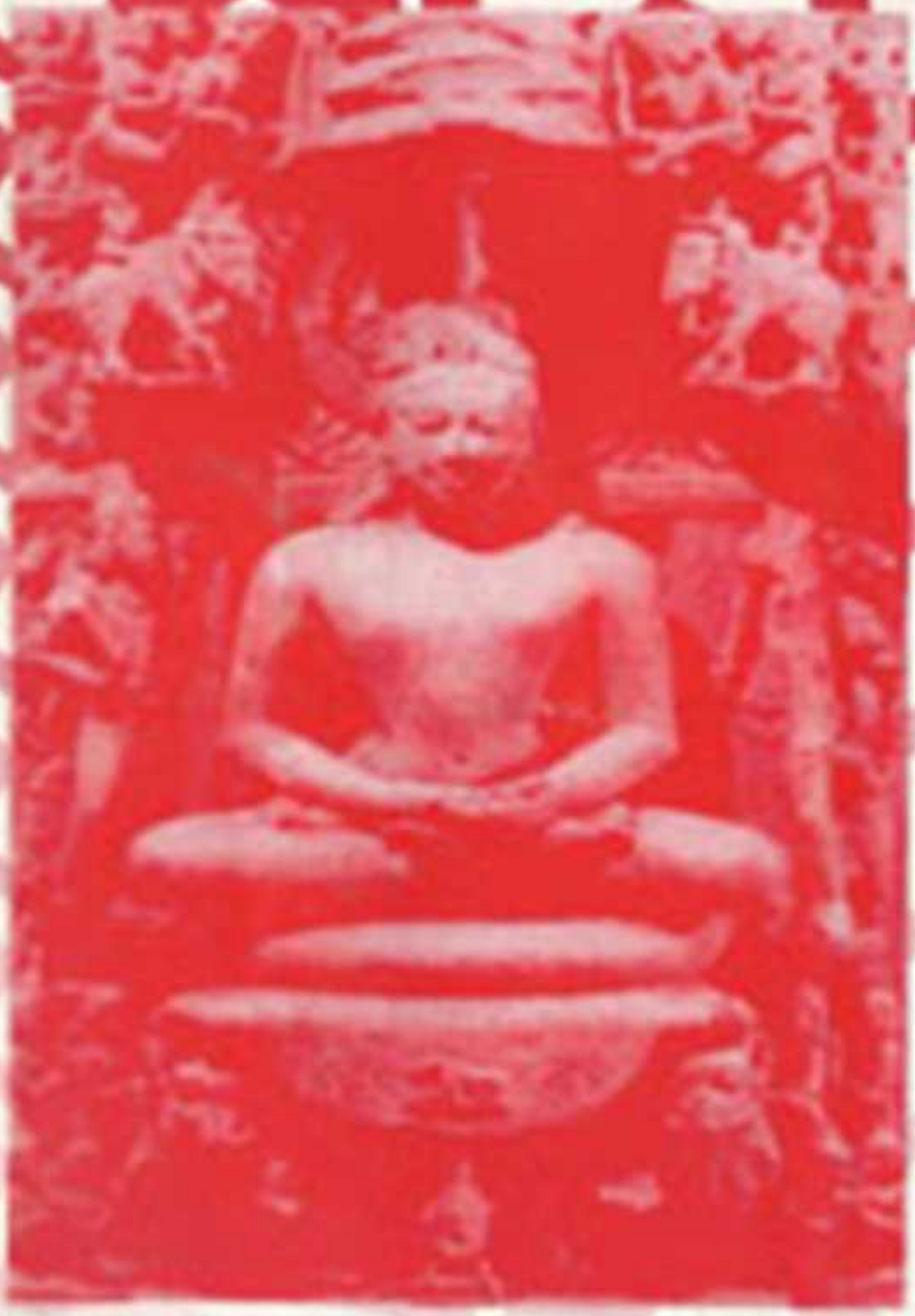

সুবর্ণ জয়ন্তী ।। পৌষ ১৪২৯ ।। তৃতীয় সংখ্যা

ISSN: 0975-8550

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক গবেষণা পত্রিকা

সুবর্ণ জয়ন্তী ।। পৌষ ১৪২৯ ।। তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

প্রাকৃত সাহিত্যের রূপরেখা	শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
জৈন ধর্ম; সুন্দর ও সুস্থ জীবন গড়ে তোলার এক জীবনপ্রণালী	রজত সুরাণা	৫
সুনন্দা সাধ্বী	জয়শ্রী লাহা	৮
জৈন ধর্ম; এক সাধারণ পরিচয়	সুখময় মাজী	১৪

সম্পাদিকা

ডঃ লতা বোথরা

সহ-সম্পাদক

শ্রী সুখময় মাজী

প্রাকৃত সাহিত্যের রূপরেখা

- শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাকৃত ভাষায় যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলি নিয়েই প্রাকৃত সাহিত্য। খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দী হতে যখন বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ তৎকালের প্রচলিত সাধারণের কথ্য ভাষায় ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন, তখন থেকেই প্রাকৃত সাহিত্যের আরম্ভ বলা যায়। আসলে অশোকের অনুশাসনাবলীতে এবং অশোকের পরবর্তী কালে তাম্রপট্টে ও শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ প্রত্নলিপিতে এবং হীনযান বৌদ্ধদের পালিতে রচিত গ্রন্থে প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ। এখানে পালি প্রাকৃত ভাষাই। জৈন আগম সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে (সংস্কৃতাংশ বাদ দিয়ে), সেতুবন্ধ, গৌড়বহ, কুমারপাল চরিত, গাথা সপ্তশতী প্রভৃতি কাব্যে প্রাকৃত সাহিত্যের যথার্থ নিদর্শন পেয়ে থাকি। এই প্রাকৃত সাহিত্য খৃষ্ট ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দী হতে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিযোগী রূপে বিরাজমান ছিল। এখানে প্রাকৃত সাহিত্যের একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

জৈন আগম সাহিত্য

প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাই জৈনদের ধর্মগ্রন্থে। মহাবীর মুখনিঃসৃত মধুর বাণী তাঁর শিষ্য ও গণধরগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে, এই জৈন আগম সাহিত্যের উৎপত্তি। এই জৈন সাহিত্যকে সাধারণত: 'সিদ্ধান্ত' বা 'আগম' বলা হয়। এর রচনা কাল সম্ভবত: খৃষ্টীয় প্রথম শতক। কারো মতে তৎপূর্বে, কারো মতে তৎপরে।

জৈনরা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত - শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। সেজন্য তাঁদের ধর্মগ্রন্থ একটু ভিন্ন প্রকারের, যদিও মূলত: উৎপত্তিস্থল এক। শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে দ্বাদশ অঙ্গ গ্রন্থ 'দৃষ্টিবাদ' লুপ্ত; আর দিগম্বরেরা বলেন, 'দৃষ্টিবাদ' তাঁদের দ্বারা রক্ষিত। এবং এই দিগম্বর সম্প্রদায়গণ কর্তৃক রক্ষিত গ্রন্থই বর্তমানে 'দিগম্বর জৈনাগম' বলে বিখ্যাত ।

দিগম্বরদের মতে 'দৃষ্টিবাদ' পাঁচ ভাগে বিভক্ত : (১) পরিকর্ম, (২) সূত্র, (৩) প্রথমানুযোগ, (৪) পূর্বগত এবং (৫) চূর্ণিকা। এদের মধ্যে 'পূর্বগত' বাদে অপর চারিটির বিষয় কিছু জানা যায় না। 'পূর্বগত' আবার চৌদ্দটি উপবিভাগে বিষয়ীকৃত। যথা -

(১) উৎপাত (২) অগ্রায়নীয়, (৩) বীর্যপ্রবাদ, (৪) অস্তিনাস্তিপ্রবাদ, (৫) জ্ঞানপ্রবাদ, (৬) সত্যপ্রবাদ, (৭) আত্মপ্রবাদ, (৮) কর্মপ্রবাদ, (৯) প্রত্যাখ্যান, (১০) বিদ্যানুবাদ (১১) কল্যাণপ্রবাদ, (১২) প্রাণবায়, (১৩) ক্রিয়া-বিশাল এবং (১৪) লোকবিন্দু-সার। অধুনা উক্ত বিষয় সমূহ যথাযথভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত না হলেও তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ থেকে জ্ঞানতে পারি।

ষটখণ্ডাগম - পুষ্পদন্ত ভূতবলি প্রণীত ' ষটখণ্ডাগম" একটি প্রাচীন দিগম্বর জৈন ধর্ম গ্রন্থ।

ইহা (জৈন) শৌরসেনী ভাষায় রচিত; মধ্যে মধ্যে অর্ধমাগধী ও মাগধী ভাষার প্রভাব দৃষ্ট হয়। ইহার রচনাকাল সম্ভবত: প্রথম বা দ্বিতীয় শতক। গ্রন্থখানি দর্শন বিষয়ক এবং কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহা ছয় খণ্ডে বিভক্ত। যথা : জীবস্থান, ক্ষুল্লকবন্ধ, বন্ধস্বামিত্ব বিষয়, বেদনা, বর্গনা ও মহাবন্ধ। পুষ্পদন্ত প্রথম ১১টি সূত্র রচনা করেন এবং তৎপরে ভূতবলি অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। সর্বসাকুল্যে ৬০০০ সূত্রদৃষ্ট হয়। বীরসেন কর্তৃক বিরচিত 'ধবলা" নাম্নী এর টীকা এরূপ প্রসিদ্ধ যে গ্রন্থখানি 'ধবলা" নামেও বিখ্যাত।

কসায় পাহুড় (কষায় প্রাভৃত) - গুণধরাচার্য কর্তৃক বিরচিত 'কসায় পাহুড়' আর একটি দিগম্বর জৈন ধর্মগ্রন্থ। ইহার রচনাকাল আনুমানিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে। এই গ্রন্থে ক্রোধাদি কষায়ের রাগদ্বেষাদিরূপে পরিণতি, তাদের প্রকৃতি, অবস্থান, অনুভাগ, প্রদেশগত বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'পেজ্জ দোস পাহুড়' (পেজ্জ = পেয়স, রাগ, দোষ = দ্বেষ এবং পাহুড় = প্রাভৃত)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এই গ্রন্থে ক্রোধাদি চারটি বা হাস্যাদি নয়টি রাগদ্বেষাদির কথা বলা হয়েছে বলে এই গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'পেজ দোস পাহুড়'। বীরসেনাচার্য এর টীকা গ্রন্থ 'জয় ধবলা' নামেও বিখ্যাত ।

মহাবন্ধ - ষটখণ্ডাগম কে যে ছয় ভাগ করা হয়, তার অন্তিম ভাগের নাম 'মহাবন্ধ' এরূপ বিশাল যে কাল ক্রমে উহা ষটখণ্ডাগম হতে পৃথক হয়ে যায় এবং পৃথক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। এই অংশের টীকাও পৃথক; টীকার নাম 'মহাধবলা'। ভূতবলি আচার্য গ্রন্থের প্রণেতা। রচনাকাল আনুমানিক দ্বিতীয় শতক। গ্রন্থখানি জৈন শৌরসেনী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জীবের বন্ধন। কিসে জীব বন্ধনদোষ হতে মুক্তি পাবে এবং কত প্রকার বন্ধন আছে, ইত্যাদি বিষয়ের এতে আলোচনা আছে।

তিলোয়পণ্ণত্তি (ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি) - বৃষভাচার্য কর্তৃক বিরচিত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 'ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি" একটি প্রাচীন দিগম্বর গ্রন্থ। এতে ভূ-বিবরণ, বিশ্ব নির্মাণ কৌশল বিষয়ক বহু তথ্যমূলক তত্ত্ব আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে এর মধ্যে জৈনদের পৌরাণিক কাহিনী, কাল নিরূপণ এবং বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। জম্বুদ্বীপ, ঘাতকীখণ্ডদ্বীপ, পুস্করদ্বীপ প্রভৃতি বহুদ্বীপের এবং জৈন কালচক্রের বিস্তৃত বিবরণ এর মধ্যে পাওয়া যায়। এক কথায় জৈনশাস্ত্র ও তত্ত্ব উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে হলে গ্রন্থখানি পাঠ করা আবশ্যক। গ্রন্থখানি মহাধিকার দ্বারা বিভক্ত এবং অতিপ্রাচীন। কারণ, 'ধবলা' নামক টীকায় এর উল্লেখ আছে।

দিগম্বর জৈনদের আগম গ্রন্থ বিশাল। কিন্তু এ যাবৎ খুব বেশী ছাপা হয় নি। অধুনা বহু পণ্ডিতের দৃষ্টি এদিকে পড়ছে।

শ্বেতাম্বর জৈনরা কিন্তু পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে তাঁদের আগম গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন না। তাঁদের মতে 'দৃষ্টিবাদ' সম্পূর্ণ লুপ্ত এবং তার অন্তর্গত কোন গ্রন্থ বর্তমানে লভ্য নয়। সে যা হোক; দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর গ্রন্থনিচয়ের সংমিশ্রণে জৈনদের ধর্মগ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক হয়েছে। সুতরাং 'দৃষ্টিবাদ' বাদে শ্বেতাম্বর জৈনদের আগম গ্রন্থ ৪৫ খানি। নিম্নে ইহাদের সংস্কৃত নাম দেওয়া হল।

(ক) **একাদশ অঙ্গ** : (১) আচারাঙ্গ সুত্র, (২) সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্র, (৩) স্থানাঙ্গ সূত্র, (৪) সমবায়াঙ্গ সূত্র, (৫) ভগবতী বা ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি, (৬) জ্ঞাতৃধর্মকথা, (৭) উপাসকদশা সুত্র, (৮) অন্তকৃদ্দশা সূত্র, (৯) অনুত্তরোপপাতিকদশা সূত্র, (১০) প্রশ্নব্যাকরণানি। (১১) বিপাকশ্রুত।

(খ) **দ্বাদশ উপাঙ্গ সূত্র** : (১২) ঔপপাতিকদশা সূত্র, (১৩) রাজপ্রশ্নীয়, (১৪) জীবাভিগম, (১৫) প্রজ্ঞাপনা সূত্র, (১৬) সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, (১৭) জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, (১৮) চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি (১৯) নিরয়াবলী (২০) কল্পাবতংসিকা, (২১) পুষ্পিকা, (২২) পুষ্পচুলিকা, (২৩) বৃষ্ণিদশা।

(গ) **দশ প্রকীর্ণ** : (২৪) চতু:শরণম্, (২৫) আতুরপ্রত্যাখ্যানম্, (২৬) ভক্তপরিজ্ঞা, (২৭) সংস্তার, (২৮) তণ্ডুলবৈচালিক, (২৯)চন্দ্রবিদ্যা, (৩০) দেবেন্দ্রস্তব, (৩১) গণিতবিদ্যা, (৩২) মহাপ্রত্যাখ্যান, (৩৩) বীরস্তব।

(ঘ) **ষট্ ছেদ সূত্র** : (৩৪) নিশীথ, (৩৫) মহানিশীথ, (৩৬) ব্যবহার, (৩৭) আচারদশা বা দশাশ্রুতস্কন্ধ, (৩৮) বৃহৎকল্প, (৩৯) জিতকল্প বা পঞ্চকল্প।

(ঙ) মূল সূত্র : (৪০) উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, (৪১) আবশ্যক সূত্র, (৪২) দশবৈকালিক সূত্র (৪৩) পিণ্ডনিযুক্তি।

(চ) **চুলিকা সূত্র** : (৪৪) নন্দী সূত্র, (৪৫) অনুযোগদ্বার।

এরপর আগম বহির্ভূত সাহিত্যের কথা বলছি।

(ক) নির্যুক্তি - জৈনগণ স্বীয় আগম গ্রন্থকে বোঝাবার জন্য সেই সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করলেন। সেই ব্যাখ্যা গ্রন্থই পরবর্তীকালে এক সাহিত্যে পরিণত হল। সেই জাতীয় সাহিত্যের নাম নিজ্জুত্তি (নিযুক্তি)। বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যেরূপ নিরুক্তের উৎপত্তি, সেরূপ জৈনাগম সাহিত্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই জাতীয় নিযুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি ।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আগম গ্রন্থের রচনাকালে বা কিছু পরেই এই নির্যুক্তি গ্রন্থের আবির্ভাব। কারণ, আগম গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় দুটি নির্যুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি--পিণ্ড নির্যুক্তি ও ওঘ

নিযুক্তি। বর্তমানে নিম্নলিখিত আগমের নিযুক্তি দৃষ্ট হয়; (১) আচারাঙ্গ সূত্রের, (২) সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রের, (৩) সূর্য প্রজ্ঞপ্তির, (৪) উত্তরাধ্যয়নের, (৫) আবশ্যক সূত্রের, (৬)দশ বৈকালিকের, (৭) দশাশ্রুত স্কন্ধের, (৮) ব্যবহার সূত্রের, (৯) ঋষিভাষিত সূত্রের।

ভদ্রবাহুকে এই জাতীয় গ্রন্থের রচয়িতা বলে ধরা হয়। নির্যুক্তি সমূহ আর্যা ছন্দে জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত। আচার্যগণ এই জাতীয় নিযুক্তি কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। পরবর্তীকালে এই নির্যুক্তিই বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হয়ে চূর্ণী ও ভাষ্য গ্রন্থে পরিণত হয় ও নতুন সাহিত্যের আকার ধারণ করে। আবার তা থেকে টীকা, বৃত্তি, অবচূর্ণি, ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে। শ্বেতাম্বর জৈনাগম গ্রন্থেরই কেবল নির্যুক্তি দৃষ্ট হয়।

(খ) **চূর্ণি**---যেমন শ্বেতাম্বরদের নিযুক্তি, তেমনি দিগম্বরদের চূর্ণিসূত্র। দিগম্বরেরা তাঁদের আগম গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই চূর্ণির উৎপত্তি করলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। নিযুক্তি হল একটি কঠিন বা পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা, আর চূর্ণি হল শব্দের এবং সূত্রের ব্যাখ্যা। নিযুক্তি সাধারণত: পদ্যাত্মক, আর চূর্ণি গদ্যাত্মক। চূর্ণি-সূত্রকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে ভাষ্য, টীকা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত চূর্ণি দৃষ্ট হয় : (১) গুণধর প্রণীত কষায়পাহুড় চূর্ণি, (২) শিববর্মার কম্মপয়ডী চূর্ণি (কর্মপ্রকৃতি), (৩) শিববর্মার সতক (চূর্ণি বা বন্ধশতক চূর্ণি), (৪) সিত্তরী চূর্ণি (সপ্ততিকা চূর্ণি)। ইহা ছাড়া লঘুশতক চূর্ণি এবং বৃহচ্ছতক চূর্ণিও আছে।

(গ) **পট্টাবলী** -পট্টাবলী বা থেরাবলী (স্থবিরাবলী) বংশ পরিচয়াত্মক সাহিত্য। অর্থাৎ জৈন ধর্মগ্রন্থে যে সমস্ত আচার্য ও তৎশিষ্যগণের নামোল্লেখ আছে, তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায় এই পট্টাবলী বা থেরাবলী সাহিত্যে। এ সাহিত্যে প্রভূত গ্রন্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে--- (১) কল্পসূত্ত থেরাবলী, (২) নন্দীসূত্র পট্টাবলী, (৩) দুসমাকাল-সমন-সঙ্ঘথয়ং, (৪) তপগচ্ছ পট্টাবলী, ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য।

(ক্রমশঃ)

'শ্রমণ' পত্রিকার ডিসেম্বর, ২০১৪ সংখ্যায় এই লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আকারে এটি ধারাবাহিক ভাবে পুনঃ প্রকাশিত হচ্ছে।

জৈন ধর্ম; সুন্দর ও সুস্থ জীবন গড়ে তোলার এক জীবনপ্রণালী।

-রজত সুরাণা

জৈন ধর্ম ভারতবর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। বাংলার ইতিহাসেও এই ধর্মের গুরুত্ব অনেক। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে বাংলার প্রাচীনতম আর্যধর্ম হল জৈনধর্ম। জৈনধর্ম মূলতঃ আধ্যাত্মিক ধর্ম। এখানে কর্ম, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জরা, মোক্ষ ইত্যাদি তত্ত্বের মাধ্যমে দুঃখময় সংসারচক্র থেকে পরিত্রাণ লাভের পথ দেখানো হয়েছে। একজন জৈনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে অনন্ত সুখ, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন এবং অনন্ত বীর্য যুক্ত সিদ্ধপদ প্রাপ্তি। সেই জন্য কায়িক, বাচিক এবং মানসিকভাবে পঞ্চ মহাব্রত অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ পালনের উপদেশ তীর্থংকর ভগবান দিয়েছেন।

কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, পারমার্থিক লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে মানুষের বর্তমান ইহলৌকিক জীবনের উপর গুরুত্ব জৈনধর্মে কম দেওয়া হয়েছে। আসলে সিদ্ধত্ব বা মোক্ষ লাভের জন্য যে পথগুলি জৈন ধর্মে দেখানো হয়েছে, সেগুলি অনুসরণ করেই অত্যন্ত সুন্দর এবং সুস্থ ব্যাক্তিক, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন লাভ করা যায়, এবং বাস্তবে সেটা আমরা দেখতেও পাই। জৈন আচার যারা নিষ্ঠাভরে পালন করেন, তাঁরা প্রায় সবাই সুস্থ দেহে সুস্থ মনের অধিকারী। এজন্য সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রেও তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত।

সকলেই বলেন, জৈন ধর্মের মূল কথা "অহিংসা পরমো ধর্ম"। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, বাস্তবে এই ধর্মের মূল কথা হল, "অহিংসা এব ধর্ম", অর্থাৎ অহিংসাই ধর্ম। এই অহিংসা ধর্মের সুচারুরূপ পালনের জন্যই সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহের কথা বলা হয়েছে। শ্রমণশ্রমণী অর্থাৎ সংসারত্যাগী সাধু ও সাধ্বীদের জন্য এই পাঁচ ব্রত সম্পূর্ণ রূপে পালনীয়; তাই সেক্ষেত্রে এঁদের সম্মিলিত নাম পঞ্চ মহাব্রত। কিন্তু শ্রাবকশ্রাবিকা অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য এগুলি যথাসাধ্য পালনীয় এবং সেক্ষেত্রে এঁদের নাম অনুব্রত। এইভাবে জৈন আচার সংহিতা শ্রমণাচার এবং শ্রাবকাচার – এই দুই ভাগে বিভক্ত।

বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য যেহেতু সাধারণ মানুষের সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য প্রতিনিধিস্থানীয় ধর্মীয় উপদেশগুলি চয়ন করে আগ্রহী মানুষদের কাছে তুলে ধরা, যাতে অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার তাঁদের জাগতিক উন্নতির পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তাই আমাদের আলোচনা শুধুমাত্র শ্রাবকাচারের মধ্যেই সীমায়িত করা হল। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে শ্রমণাচারের কিছু কথাও আসবে, যেগুলি শ্রাবকশ্রাবিকাদের পক্ষেও পালন করা সম্ভব।

জৈন গৃহীদের জীবনে ব্রত ও শীল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর – উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই অত্যন্ত আদৃত 'তত্ত্বার্থসূত্র' গ্রন্থে আচার্য উমাস্বাতী ব্রতের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

-"**হিংসাऽনৃতস্তেয়াব্রহ্মপরিগ্রহেভ্যো বিরতিব্রতম্**" (তত্ত্বার্থসূত্র 7/1)।

অর্থাৎ হিংসা, অনৃত (মিথ্যা), স্তেয় (চৌর্য), অব্রহ্ম এবং পরিগ্রহ থেকে বিরত থাকাই ব্রত। জৈন শ্রাবক বা শ্রাবিকা মানেই সে ব্রতী। জৈন পরিবারে আজীবন সকলেই ব্রত পালন করেন; অবশ্যই অনুব্রতরূপে। অনুব্রত হিসাবে অহিংসার অর্থ ন্যূনতম হিংসা, সত্যের অর্থ যথাসাধ্য সত্য, অচৌর্যের অর্থ যথাসাধ্য অচৌর্য, ব্রহ্মচর্যের অর্থ নিজ বিবাহিত স্ত্রী/স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকা এবং অপরিগ্রহের অর্থ আয় এবং সঞ্চয়ের একটি নির্দিষ্ট সীমা রাখা এবং ধনসম্পত্তিতে অতিরিক্ত আসক্তি না রাখা। মহাব্রতের সাথে অনুব্রতের এই পার্থক্যই জৈনধর্মকে ব্যাবহারিক ধর্মের রূপ দিয়েছে।

তদুপরি এখানে ব্রতের সুরক্ষার জন্য তিন **গুপ্তি** এবং পাঁচ **সমিতি**র উপদেশ দেওয়া আছে। 'গুপ্তি' এবং 'সমিতি' জৈন ধর্মের পারিভাষিক শব্দ। তত্ত্বার্থসূত্রে পাই - **সম্যগ্-যোগনিগ্রহো গুপ্তিঃ** (9/4)। যোগ শব্দের অর্থ ক্রিয়াকলাপ। আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সংযত রূপে পালন করাই গুপ্তি। ক্রিয়া সর্বাধিক তিন প্রকারের হতে পারে – মানসিক, বাচিক এবং কায়িক। অতএব গুপ্তিও তিন প্রকার – মনোগুপ্তি, বচনগুপ্তি এবং কায়গুপ্তি।

অনুরূপভাবে সমিতি পাঁচ প্রকার। **ঈর্যাভাষণাদাননিক্ষেপোৎসর্গাঃ সমিতয়ঃ** (তত্ত্বার্থসূত্র 9/5)। ঈর্যা সমিতি, ভাষা সমিতি, এষণা সমিতি, আদান নিক্ষেপ সমিতি এবং উৎসর্গ সমিতি। 'সমিতি'র অর্থ সম্যকরূপে অর্থাৎ যথাযথরূপে করা। ঈর্যা সমিতির অর্থ চলার সময় সম্মুখে চার হাত পরিমাণ পথে দৃষ্টি রেখে চলা। ভাষা সমিতির অর্থ হল কথা বলার সময় হিত, মিত ও প্রিয় বচন ব্যবহার করা। শরীর রক্ষা ও শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজনে অনাসক্ত রূপে নির্দোষ আহার গ্রহণ করাকে এষণা সমিতি বলা হয়। আদান নিক্ষেপ সমিতির অর্থ যে কোনও জিনিষ যথাযথরূপে ও যথাযথ স্থানে রাখা, যথাযথভাবে নেওয়া এবং ব্যবহারের পর সযত্নে যথাযথ স্থানেই রেখে দেওয়া। আর, যে সমস্ত জায়গায় সাধারণতঃ মানুষের যাতায়াত নেই, জন্তু জানোয়ার থাকে না, সেইরূপ নির্জন জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করার নির্দেশই হল উৎসর্গ সমিতি। যদিও গুপ্তি ও সমিতি বিশেষভাবে শ্রমণশ্রমণীদের জন্য উপদিষ্ট, তবুও তাঁদের অনুসরণে শ্রাবকশ্রাবিকাদেরও এগুলি যথাসাধ্য পালনীয়।

এছাড়াও মোট বারো প্রকারের তপস্যার কথা জৈন ধর্মে বলা আছে। তপস্যা মানেই যে বনে গিয়ে কৃচ্ছসাধন করতে হবে, তা নয়। জৈন শ্রাবকদের সংযমিত জীবনযাপনেরই অংশ হল তপ। তপ মোট বারো প্রকার। এই বারো প্রকারের মধ্যে ছয় প্রকার হল বাহ্য তপ এবং ছয় প্রকার হল, আভ্যন্তর তপ।

তত্ত্বার্থসূত্রকার বলেছেন, **"অনশনাবমৌদর্য বৃত্তিপরিসংখ্যান রসপরিত্যাগ বিবিক্তশয্যাসন কায়ক্লেশা বাহ্যং তপঃ"**। (তত্ত্বার্থসূত্র 9/19)। **অনশন** অর্থাৎ উপবাস, **অবমৌদর্য** অর্থাৎ খিদের তুলনায় অল্প একটু কম খাওয়া, **বৃত্তিপরিসংখ্যান** অর্থাৎ আহারের জন্য বেরোনোর আগে ক'টি ঘরে আহার ভিক্ষায় যাব, ইত্যাদি সংকল্প নেওয়া, **রসপরিত্যাগ** অর্থাৎ মুখরোচক কিন্তু শরীরের পক্ষে হানিকর আহার গ্রহণ না করা, **বিবিক্তশয্যাসন** অর্থাৎ নির্বাধ ব্রহ্মচর্য, স্বাধ্যায় ও ধ্যানের অনুকূল স্থান চয়ন, শরীরকে শারীরিক কষ্ট সহ্য করার উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কৃচ্ছসাধনই হল **কায়ক্লেশ**।

জৈন শ্রাবকশ্রাবিকারা ব্রতগুলি তো যথাসাধ্য পালন করেনই, সেই সাথে সমিতি ও গুপ্তি তাঁদের জীবনধারার অঙ্গীভূত হলে এই ব্রত, সমিতি এবং গুপ্তি তাঁদের জীবন সুন্দররূপে গড়ে তোলে।

(ক্রমশঃ)

Some advices of Lord Jinendra

1. Do not injure, abuse, oppress, enslave, insult, torment, torture, or kill any creature or living being.
2. Do unto others as you would like to be done by. Injury or violence done by you to any life in any form, animal or human, is as harmful as it would be if caused to your own self.
3. Kill not, cause no pain. Non-violence is the greatest religion.
4. In happiness & suffering, in joy and grief, we should regard all creatures as we regard our own self.
5. All breathing, existing, living, sentient creatures should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away.
6. Anger begets more anger, and forgiveness and love lead to more forgiveness and love.
7. Live and allow others to live; hurt no one; life is dear to all living beings.

সুনন্দা সাধ্বী

- জয়শ্রী লাহা

পুরাকালে ভারতবর্ষে পৃথ্বীভূষণ নামে এক নগর ছিল। সেই নগরের রাজা ছিলেন কনকধ্বজ। রাজা কনকধ্বজের অপরূপ রূপসী এক কন্যা ছিল। রাজকন্যার নাম ছিল সুনন্দা। রাজপ্রাসাদের নিকটেই ছিল বাজার। বাজারে একটি পানের দোকানে শ্রেষ্ঠী বসুদত্তের পুত্র রূপসেন পান খেতে আসত। রূপসেন ছিল সত্যিই রূপবান। একদিন রূপসেন যখন রাজভবনের সামনের ঐ দোকানে পান খেতে আসে, তখন হঠাৎ সুনন্দার চোখ তার উপর পড়ে যায়। রূপসেনের রূপ দেখেই সুনন্দা মদনদেবের কামবানে বিদ্ধ হয়ে পড়ে। তার প্রতি রোমকূপে রোমকূপে ভোগ বাসনার দুর্নিবার আগুন যেন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। রূপসেনের সাথে মিলনের জন্য সে অধীর হয়ে ওঠে। তার এক অত্যন্ত বিশ্বস্ত দাসী ছিল। সে সেই দাসীকে দিয়ে গোপনে বার্তা পাঠায় রূপসেনের কাছে। রাজকন্যার অলোকসামান্য রূপ ও লাবণ্যের কথা রূপসেনের অজানা ছিল না। তার কাছে তো সুনন্দার এই বার্তা যেন মেঘ না চাইতেই জল। ফলে যেটা স্বাভাবিক, তা'ই হল। দাসীর সহায়তায় তাঁদের মধ্যে প্রণয় গড়ে উঠল। তবে এই সম্পর্ককে প্রণয় না বলে কামবাসনা পরিতৃপ্তির উভয়পাক্ষিক উদগ্র আসক্তি বলাটাই বোধ হয় সমীচীন হবে। তারা দু'জনেই মিলনের সুযোগ খুঁজতে লাগল। কিন্তু রাজা ও রানীর চোখ এড়িয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও বটে। এদিকে সুনন্দার তো ধৈর্য আর বাঁধ মানে না।

এমন সময় হঠাৎই সুনন্দার কাছে একটা সুযোগ এসে গেল। পৃথ্বীভূষণ নগরে মহা ধুমধামের সাথে পালিত হত কৌমুদী উৎসব। উৎসবের দিন রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত মানুষ ঐ উৎসবে অংশ নিতে নগরের বাইরে জড়ো হত। সুনন্দা তার সেই দাসীর হাত দিয়ে রূপসেনকে উৎসবের দিন রাত্রিবেলায় তার কক্ষে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। সেদিন রাজা ও রানী সদলবলে উৎসবে যাওয়ার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন সুনন্দা তার নিজের ঘরে অসুস্থতার ভান করে শুয়ে রইল। রানীমা যখন সুনন্দাকে তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বললেন, তখন সুনন্দা মা'কে জানাল যে, তার মাথাব্যথা করছে, তাই তারপক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রানীমা তো সুনন্দার অসুস্থতার কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এদিকে আবার নগরীর সমস্ত লোক রাজারানীর জন্য উৎসবের মাঠে অপেক্ষা করছে। তাঁরা না গেলে খারাপ হবে। হয়তো তাঁদের অনুপস্থিতিতে উৎসব শুরুই হবে না। অগত্যা রানীমা সুনন্দাকে ভালোভাবে বিশ্রামের উপদেশ দিয়ে সেই দাসীকে তার পরিচর্যায় রেখে

সবাই চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে সুনন্দার দাসী সুনন্দার নির্দেশমতো তার কক্ষের খোলা জানালা দিয়ে একটি লম্বা মজবুত দড়ির সিঁড়ি নীচে ঝুলিয়ে দিল, যাতে রূপসেন ঐ দড়ি ধরে সুনন্দার ঘরে ঢুকতে পারে। এদিকে রূপসেনও ভালো করে সেজেগুজে নির্ধারিত সময়ে সুনন্দার সঙ্গে অভিসারে উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু হায়, বেচারার ভাগ্য নিতান্তই বিরূপ। সে যখন অভিসারে যাচ্ছিল, তখন পথের ধারের একটি জরাজীর্ণ বাড়ির দেওয়াল তার ওপর ভেঙ্গে পড়ল এবং সেই দেওয়াল চাপা পড়ে সে মারা গেল। তার অতৃপ্ত বাসনা অতৃপ্তই থেকে গেল। এর ফলে তার আত্মার যেমন ভাব-পাপ বন্ধ হল, তেমনি আত্মার মধ্যে সুনন্দার প্রতি মোহ ও আসক্তিও রয়ে গেল।

নগর মাত্রেই চোর, ডাকাত, ইত্যাদি দুষ্কৃতী থাকবেই। পৃথ্বীভূষণ নগরেও মহাবল নামে এক জুয়াড়ি ছিল। সেদিন সে দেখল যে, আজ তো সবাই উৎসবের মাঠে চলে গেছে; অতএব, নগর আজ জনশূন্য। অর্থাৎ আজ চুরি করার সুবর্ণ সুযোগ। সে বেরিয়ে পড়ল চুরি করতে। চুরির উদ্দেশ্যে ঘুরতে ঘুরতে যখন সে রাজভবনের পেছনের অংশে এল, তখন সেই দড়ির সিঁড়িটি তার চোখে পড়ে গেল। সে তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আজ মোটা দাঁও মারা যাবে। এই তো রাজভবনে প্রবেশের সুন্দর রাস্তা। সে দড়িটায় টান দিয়ে পরীক্ষা করে সেটা বেয়ে উঠতে শুরু করল। দাসী তো খুব সতর্ক ছিল। সে ভেবে নিল, আজ যার আসার জন্য সুনন্দা আধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, সেই রূপসেন যথা সময়েই উপস্থিত হচ্ছে। রূপসেনের সাথে সুনন্দার সমাগম যাতে একেবারেই গোপন থাকে, সেজন্য ঐ দাসী ঘরের প্রদীপটি আগেই নিবিয়ে রেখেছিল। মহাবল জুয়াড়ি ঘরে প্রবেশ করতেই দাসী তাকে রূপসেন ভেবে নিয়ে মহা সমাদরে সুনন্দার বিছানায় পৌঁছে দিয়ে নিজে দরজার বাইরে গিয়ে পাহারা দিতে লাগল। সুনন্দাও অন্ধকারে তাকে রূপসেন ভেবে নিয়ে প্রাণভরে তার সাথে কামকেলিতে মত্ত হয়ে পড়ল। এই অভাবিত সৌভাগ্যের জন্য মনে মনে নিজের কপালকে ধন্যবাদ জানিয়ে মহাবলও এই কুকৃত্য সমাপন করে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুদিন পর সুনন্দার শরীরে গর্ভাবস্থার লক্ষণ ফুটে উঠল। কর্মের বিচিত্র প্রভাবে সুনন্দার প্রতি তার আসক্তির ফল হিসাবে রূপসেনের আত্মাই সুনন্দার গর্ভে ভ্রূণ হিসাবে জন্ম নিল। কিন্তু সে পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পেল না। রাজপরিবারের সম্মান রক্ষার্থে অতি সঙ্গোপনে সুনন্দার গর্ভপাত করানো হল। ভয়ানক কষ্ট ও যন্ত্রণা পেয়ে রূপসেনের আত্মা সুনন্দার গর্ভের মধ্যেই মারা গেল। পরের জন্মে সে সাপরূপে ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠিত নগরে জন্ম নিল।

সুনন্দার এই কলঙ্কের কথা গোপনই রইল। সৌন্দর্য তো তার অসাধারণ ছিলই। তাই একদিন ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠিত নগরের রাজা পৃথ্বীবল্লভের সঙ্গে সাড়ম্বরে তার বিয়ে হয়ে গেল। একদিন রাজার সাথে

সবাই চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে সুনন্দার দাসী সুনন্দার নির্দেশমতো তার কক্ষের খোলা জানালা দিয়ে একটি লম্বা মজবুত দড়ির সিঁড়ি নীচে ঝুলিয়ে দিল, যাতে রূপসেন ঐ দড়ি ধরে সুনন্দার ঘরে ঢুকতে পারে। এদিকে রূপসেনও ভালো করে সেজেগুজে নির্ধারিত সময়ে সুনন্দার সঙ্গে অভিসারে উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু হায়, বেচারার ভাগ্য নিতান্তই বিরূপ। সে যখন অভিসারে যাচ্ছিল, তখন পথের ধারের একটি জরাজীর্ণ বাড়ির দেওয়াল তার ওপর ভেঙ্গে পড়ল এবং সেই দেওয়াল চাপা পড়ে সে মারা গেল। তার অতৃপ্ত বাসনা অতৃপ্তই থেকে গেল। এর ফলে তার আত্মার যেমন ভাব-পাপ বন্ধ হল, তেমনি আত্মার মধ্যে সুনন্দার প্রতি মোহ ও আসক্তিও রয়ে গেল।

নগর মাত্রেই চোর, ডাকাত, ইত্যাদি দুষ্কৃতী থাকবেই। পৃথ্বীভূষণ নগরেও মহাবল নামে এক জুয়াড়ি ছিল। সেদিন সে দেখল যে, আজ তো সবাই উৎসবের মাঠে চলে গেছে; অতএব, নগর আজ জনশূন্য। অর্থাৎ আজ চুরি করার সুবর্ণ সুযোগ। সে বেরিয়ে পড়ল চুরি করতে। চুরির উদ্দেশ্যে ঘুরতে ঘুরতে যখন সে রাজভবনের পেছনের অংশে এল, তখন সেই দড়ির সিঁড়িটি তার চোখে পড়ে গেল। সে তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আজ মোটা দাঁও মারা যাবে। এই তো রাজভবনে প্রবেশের সুন্দর রাস্তা। সে দড়িটায় টান দিয়ে পরীক্ষা করে সেটা বেয়ে উঠতে শুরু করল। দাসী তো খুব সতর্ক ছিল। সে ভেবে নিল, আজ যার আসার জন্য সুনন্দা আধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, সেই রূপসেন যথা সময়েই উপস্থিত হচ্ছে। রূপসেনের সাথে সুনন্দার সমাগম যাতে একেবারেই গোপন থাকে, সেজন্য ঐ দাসী ঘরের প্রদীপটি আগেই নিবিয়ে রেখেছিল। মহাবল জুয়াড়ি ঘরে প্রবেশ করতেই দাসী তাকে রূপসেন ভেবে নিয়ে মহা সমাদরে সুনন্দার বিছানায় পৌঁছে দিয়ে নিজে দরজার বাইরে গিয়ে পাহারা দিতে লাগল। সুনন্দাও অন্ধকারে তাকে রূপসেন ভেবে নিয়ে প্রাণভরে তার সাথে কামকেলিতে মত্ত হয়ে পড়ল। এই অভাবিত সৌভাগ্যের জন্য মনে মনে নিজের কপালকে ধন্যবাদ জানিয়ে মহাবলও এই কুকৃত্য সমাপন করে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুদিন পর সুনন্দার শরীরে গর্ভাবস্থার লক্ষণ ফুটে উঠল। কর্মের বিচিত্র প্রভাবে সুনন্দার প্রতি তার আসক্তির ফল হিসাবে রূপসেনের আত্মাই সুনন্দার গর্ভে ভ্রূণ হিসাবে জন্ম নিল। কিন্তু সে পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পেল না। রাজপরিবারের সম্মান রক্ষার্থে অতি সঙ্গোপনে সুনন্দার গর্ভপাত করানো হল। ভয়ানক কষ্ট ও যন্ত্রণা পেয়ে রূপসেনের আত্মা সুনন্দার গর্ভের মধ্যেই মারা গেল। পরের জন্মে সে সাপরূপে ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠিত নগরে জন্ম নিল।

সুনন্দার এই কলঙ্কের কথা গোপনই রইল। সৌন্দর্য তো তার অসাধারণ ছিলই। তাই একদিন ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠিত নগরের রাজা পৃথ্বীবল্লভের সঙ্গে সাড়ম্বরে তার বিয়ে হয়ে গেল। একদিন রাজার সাথে

রানী সুনন্দা যখন প্রমোদোদ্যানে প্রমোদভ্রমণ করছিলেন, তখন সাপরূপে জাত রূপসেনের জীব সেই বাগানেই বিচরণ করছিল। হঠাৎ সুনন্দা তার চোখে পড়ে যায়। সুনন্দাকে দেখেই তার মনে পূর্বজন্মের অতৃপ্ত প্রেম ও আসক্তি জেগে ওঠে। ফলে সে মুগ্ধ হয়ে স্থিরভাবে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে। সুনন্দা তো আর অতশত জানে না। সাপটিকে তার দিকে একভাবে চেয়ে থাকতে দেখে সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায়। সুনন্দা ভয় পেয়ে যাওয়ায় রাজা সাপটিকে মেরে ফেলেন। আবার যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সাপটি আর্তধ্যানে মারা গেল।

পরের জন্মে ঐ রূপসেনের আত্মা কাক রূপে জন্ম নেয়। একদিন রাজা যখন বাগানে রাণীর সাথে সঙ্গীত উপভোগ করছিলেন, তখন কাকটি সুনন্দাকে দেখতে পায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে তখন জোরে জোরে ডাকতে থাকে। কাকের একটানা কর্কশ স্বরে রসভঙ্গ হওয়ায় রাজা প্রচণ্ড বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কাকটিকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলেন।

এরপর রূপসেনের আত্মা এই বাগানেই রাজহাঁস রূপে জন্ম নেয়। কালক্রমে সেই রাজহাঁসের সাথে একটি কাকের বন্ধুত্ব হয়। একদিন ঐ রাজহাঁস এবং কাক একটি গাছের ডালে বসেছিল। এমন সময় রাজা সুনন্দাকে নিয়ে বাগানে এলেন এবং ঐ গাছের নীচেই দু'জনে বসলেন। যেই না রাজহাঁসটি সুনন্দাকে দেখল, অমনই জন্মজন্মান্তরের আসক্তি তারমধ্যে আবার জেগে উঠল। সে সবকিছু ভুলে তন্ময় হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কাকের বোধ হয়, তার এই তন্ময় হয়ে সুনন্দাকে দেখতে থাকাটা পছন্দ হল না। তখন ঐ দুষ্ট কাক গাছের উপর থেকে রাজার কাপড়ে মলত্যাগ করেই সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে গেল। এদিকে রাজার কাপড় বিষ্ঠায় নোংরা হতেই রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে উপরের দিকে তাকালেন। দেখলেন, তাঁদের ঠিক মাথার উপর গাছের ডালে রাজহাঁসটি বসে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ধরে নিলেন যে, এটা ঐ হাঁসটারই কুকীর্তি। ফলে রাজা তাকে তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেললেন।

রূপসেনের আত্মায় তার সেই জন্মে দৃষ্টিজনিত যে মোহের সংস্কার জন্মেছিল, সেই সংস্কারই তার পরবর্তী জন্মগুলিতে উদিত হয়েছিল এবং তারই ফলে তাকে বারবার অপঘাতে পীড়াদায়ক মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

ষষ্ঠ জন্মে রূপসেনের আত্মা এক হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মেও সুনন্দার প্রতি ভালোবাসার কারণে রাজার হাতে তাকে মরতে হয়। সুনন্দাকে দেখে সেই হরিণটি এতই মোহিত হয়ে যায় যে, সে নিশ্চল হয়ে তাকে দেখতেই থাকে। আর সেই সুযোগে রাজা তাকে বধ করেন। হরিণ শিকার তো বরাবরই রাজাদের প্রিয় ব্যসন। মৃত্যুর পর রূপসেনের আত্মা এক হাতি রূপে সুগ্রামের জঙ্গলে জন্মগ্রহণ করে। এদিকে রাজা রানীর আহারের জন্য রাজার পাচক সেই হরিণটির

মাংস রান্না করল। খুব আনন্দের সাথে রাজা এবং রানী রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে করতে সেই মাংস খাচ্ছেন।

ঠিক সেই সময় দুজন মুনি পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজারানীকে আনন্দের সাথে ঐ হরিণের মাংস ভোজন করতে দেখে একজন মুনিরাজ অপর মুনিরাজকে বললেন, কর্মের কী বিচিত্র গতি। যে সুনন্দার জন্য বেচারা রূপসেন শুধু চোখ ও মনের কল্পনায় কর্মবন্ধন করে সাত-সাত জন্ম ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করল, সেই সুনন্দা আজ তারই মাংস খাচ্ছে। নিচু স্বরে একথা বলে তিনি মাথা নাড়লেন। তা দেখে রাজা-রানী মুনিশ্রীকে মাথা নাড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন ঐ মুনি স্পষ্ট করে বললেন , "যার প্রতি একদা সুনন্দার প্রণয় ছিল, আজ সুনন্দা তারই মাংস খাচ্ছে। তাই আমরা অবাক হয়ে মাথা নাড়লাম"। এই কথা শুনে সুনন্দা চমকে গেল; সে খুবই মর্মাহত হল। সে কাতর স্বরে মুনিরাজকে বলল, "হে গুরুদেব! আমার প্রতি শুধু চোখ ও মনের পাপ করার জন্য যদি রূপসেনের সাত সাত জন্ম পর্যন্ত এমন দুর্দশা হয়, তাহলে আমার কী হবে? আমি তো তার চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে দৈহিক পাপ রূপ পঙ্কে নিজেকে কলঙ্কিত করেছি"। তখন মুনি বললেন, "পূর্বকৃত অপরাধের সমালোচনা করে চারিত্র গ্রহণ করলে আত্মা পবিত্র হয়। সেই পথে নিজ আত্মাকে পবিত্র করলে তুমি মোক্ষও লাভ করতে পারো"। মুনিরাজের কাছে ধর্মোপদেশ লাভ করে সুনন্দা তৎক্ষণাৎ দীক্ষা গ্রহণ করল। দীক্ষার পর সাধ্বী জীবনচর্যা পালনের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতির সাধনায় সে ব্যাপৃত হল এবং সাধ্বী সুনন্দা নামে পরিচিতি লাভ করল।

সাধ্বী সুনন্দা স্বকৃত অপরাধের সমালোচনা ও প্রায়শ্চিত্ত করে এবং সংযম ধারণ করে শেষ পর্যন্ত অবধিজ্ঞান লাভ করেন।

এরপর একদিন দয়াবতী সাধ্বী সুনন্দা বর্তমানে হাতি রূপে জাত রত্নসেনের জন্ম জন্মান্তরের দুর্দশার কথা স্মরণ করে নিজের গুরু আর্যিকা মাতাজীর অনুমতি নিয়ে সেই হাতিকে প্রবোধন দেওয়ার জন্য আরও চারজন সাধ্বীর সাথে সুগ্রামের জঙ্গলে এলেন। মদোন্মত্ত সেই হাতির দৃষ্টি সুনন্দার ওপর পড়ামাত্রই সে আবার মোহগ্রস্ত হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ল। তখন সাধ্বীজী বললেন - "বুজ্ঝ-বুজ্ঝ রুপসেন" (হে রূপসেন! বোঝ, বোঝ)। "আমার প্রতি আসক্তির কারণে এত দুঃখের শিকার হয়েও কেন তুমি আমার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করছ না"? সাধ্বী সুনন্দার এই কথা শুনে হাতির জাতিস্মরণ জ্ঞান জেগে উঠল। আগের সাত জন্মের দুর্দশা সে তখন স্পষ্ট দেখতে পেল। সে খুব অনুতাপ করতে লাগল। "হায়! হায়! এ আমি কী করেছি! অজ্ঞানতা ও ভ্রমের বশীভূত হয়ে বার বার আর্তধ্যানে মৃত্যুবরণ করে আমি শুধু দুঃখভোগই করে গেলাম। এখন আর আমি দুঃখ পেতে চাই না"। এই রকম ভাবতে ভাবতে ঐ হাতির আত্মিক জাগরণ ঘটে গেল। সাধ্বীজী তখন রাজাকে বললেন, "এখন এই হাতিটি আপনার ধর্মভাই। অতএব এর দেখভাল করার দায়িত্ব আপনার"। রাজা

সানন্দে সম্মত হলেন। ঐ হাতি বেলা, তেলা, ইত্যাদি তপ করতে করতে ধর্মসম্মত চারিত্র পালন করে অন্তিমকালে সমাধিমরণ গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করল এবং দুঃখের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে অষ্টম দেবলোকে দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করল। যথাকালে সে সিদ্ধপদও লাভ করল। একইভাবে সুনন্দা সাধ্বীও তার কর্ম সম্পন্ন করে কেবলজ্ঞান লাভ করে অক্ষয়পদ লাভ করলেন।

এই গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শুধুমাত্র মন ও দৃষ্টির পাপও কতটা ভয়াবহ হতে পারে? তার সমালোচনা না করায় রূপসেনের সাত সাতটা জন্ম বরবাদ হয়ে যায়। অন্যদিকে, সমালোচনার কী আশ্চর্য প্রভাব যে, সাধ্বীজী সুনন্দা শল্যরহিত বিশুদ্ধ সংযম পালন করে কেবলজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মোক্ষলাভ করেছিলেন।

জৈন ধর্ম; এক সাধারণ পরিচয়

- সুখময় মাজী

শুধু ভারতীয় সংস্কৃতিতে নয়, সারা বিশ্বেরই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে 'ধর্ম' এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। এর ইংরাজি প্রতিশব্দ হিসাবে রিলিজিয়ন (religion) শব্দ ব্যবহার করা হয়। অনেকের মতে প্রাচীন ইংরেজিতে প্রচলিত religioun শব্দ থেকে, যার অর্থ হল, জীবনের এক আধ্যাত্মিক ব্রতসমৃদ্ধ অবস্থা। অনেকে এর অর্থ করেন, একটি ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস, এই শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং এই শক্তিকে খুশি করার ইচ্ছার নির্দেশক কাজ বা আচরণ। কেউ কেউ বলেন, Religion শব্দটি ল্যাটিন ভাষার রেলিজিওনেম (religionem) শব্দ থেকে ইঙ্গ-ফরাসী religiun রূপে প্রথমে পরিবর্তিত হয়ে তারপর আর একধাপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইংরেজিতে বর্তমান রূপ নিয়েছে। অথবা প্রাচীন ফরাসীতে religion শব্দটার ব্যবহার ছিল; সেখান থেকেই অবিকৃত বানানে ইংরেজিতে এসেছে। ল্যাটিন রেলিজিওনেম (religionem) শব্দ অনেক অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, যা পবিত্র, তা'র প্রতি শ্রদ্ধা, দেবতাদের প্রতি সমীহ, বিবেকশীলতা, সঠিক সম্বন্ধে জ্ঞান, নৈতিক বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদি। ইঙ্গ-ফরাসী religion ও প্রাচীন ফরাসী religion শব্দদ্বয় সমার্থক। এদেরও একাধিক অর্থ - সৎ চারিত্র, ভক্তি এবং বিশ্বাসভিত্তিক আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়।

কিন্তু ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা ধর্ম শব্দের ইংরেজি অর্থ religion ধরি, তাহলে সেই শব্দটির আরেকটি ব্যুৎপত্তি আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি মনে হয়।এই ব্যুৎপত্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্ম এক যোজক তত্ত্ব, তা যোগ করে, জোড়া লাগায়। এই মত অনুসারে ল্যাটিন 'রি (re)' এবং 'লিজের (ligare)' শব্দদুটি মিলে 'রিলিজিয়ন' শব্দ তৈরি হয়েছে। এর অর্থ হল পুনরায় যুক্ত করা (to tie or bind again)। ধর্ম হল মানুষকে মানুষের সাথে এবং আত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলিয়ে দেওয়ার কলা। জীবকে শাশ্বত শক্তি এবং সুখ প্রদানের এ এক অমোঘ এবং শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। এটা সংযোজনের সূচক। উল্টোদিকে School বা সম্প্রদায় শব্দ বিভাজনের সূচক। সম্প্রদায় মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে, মানুষকে আলাদা করে। এভাবে, যেখানে ধর্মের কাজ হল যুক্ত করা সেখানে সম্প্রদায়ের কাজ হল বিভাজন করা। ধর্ম প্রাণীকে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে উত্তরোত্তর উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যায়। ধর্ম হল আত্মার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য; স্ব-ভাব। ধর্ম হল আন্তরিক। অন্যদিকে, সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ কেবল বাহ্য আচার আচরণে সীমাবদ্ধ; আর সেই জন্যই এটা বাহ্যিক। ধর্মীয় আস্থা ও বিশ্বাস মানবীয় সৎ গুণগুলিকে ব্যক্তির জীবনে জীবন্ত করে তোলে, যেখানে সম্প্রদায় কেবল কিছু আচার আচরণের উপরই অধিকতম গুরুত্ব আরোপ করে, আত্মিক সংস্কারের গুরুত্ব সেখানে গৌণ।

জীবনের সঠিক অর্থ জানার এবং বোঝার জন্য ধর্মই একমাত্র মাধ্যম হতে পারে। সেই ধর্মই

বাস্তবিকভাবে ধর্ম হতে পারে যা আত্মাকে সুখ, শান্তি এবং প্রসন্নতার রাস্তায় গতিশীল রাখে। ধর্ম সেটাই, যা আমাদের মনকে শান্ত করে আমাদের উত্তেজনার প্রশমন ঘটায় এবং আমাদের সহনশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে। জৈন ধর্ম জীবনজ্যোতির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জীবনকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলার সিদ্ধান্ত। তা সতত অন্তরের মধ্যে জ্বলতে থাকা এক অনির্বাণ প্রদীপ, যা প্রতিনিয়ত কষায়সমূহের অন্ধকার দূর করতে সহায়তা করে। নিখাদ সত্য এটাই যে, আত্মার দ্বারা আত্মার জন্য আত্মার কল্যাণের সর্বোত্তম উপায় হল ধর্ম।

আমরা আগেই দেখলাম, ইংরেজি religion শব্দটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দের অর্থের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ধর্ম শব্দ √ধৃ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধারনাদ্ ধর্ম"। এর অর্থ হল, জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করা। অথবা "দুর্গতৌ প্রপতন্তমাত্মানং ধারয়তীতি ধর্ম"। দুর্গতির মধ্যে পতনশীল আত্মাকে যা ধরে রাখে, তা'ই ধর্ম। ধর্মের বনিয়াদের উপরই পুরো জীবনের প্রাসাদ তৈরি হয়। ধর্মের অনুপস্থিতিতে মানুষ অসম্পূর্ণ, অধুরা। এইজন্য বৈদিক ধর্মের মহান ঋষি পুরো জগতকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, "ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা", অর্থাৎ ধর্ম এই বিশ্বজগতের আধার, এই বিশ্বজগতের প্রাণ। কার্তিকেয় অনুপ্রেক্ষায় বলা হয়েছে,

"ধম্মো বত্থুসহাবো, খমাদিভাবো য দসবিহ ধম্মো।
রয়নতয়ং চ ধম্মো, জীবাণং রক্খণং ধম্মো"।

অর্থাৎ বস্তুর স্বভাব হল ধর্ম। ক্ষমা ইত্যাদি ভাব অনুসারে ধর্ম দশপ্রকার। রত্নত্রয় অর্থাৎ সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান এবং সম্যগ্ চারিত্রও হল ধর্ম। জীবকে রক্ষা করাও ধর্ম। এখানে সর্বপ্রথমে বস্তুর স্বভাবকে ধর্ম বলা হয়েছে; যেমন আগুনের ধর্ম জ্বলন, জলের ধর্ম শীতলতা। এক্ষেত্রে ধর্ম শব্দের তাৎপর্য বস্তুর স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু যখন বলা হয় যে, দুঃখী এবং পীড়িতজনের সেবা করা মানুষের ধর্ম, অথবা গুরুর আজ্ঞা পালন করা শিষ্যের ধর্ম, তখন এই ধর্মকে দায়িত্ব বা কর্তব্য বলা যায়। এইভাবে যখন আমরা বলি, আমার ধর্ম জৈন, আর অন্য একজনের ধর্ম বৌদ্ধ, তখন আমরা এক তৃতীয় ভাবনা বোঝাই। এখানে ধর্মের অর্থ কোনও পবিত্র সত্তা, সিদ্ধান্ত বা উপাসনা পদ্ধতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, আস্থা বা বিশ্বাস। অধিকাংশ সময় আমরা এই তৃতীয় অর্থেই ধর্ম শব্দটিকে ব্যবহার করি; কিন্তু এটা ধর্মের অভিরূঢ় অর্থ, সঠিক অর্থ নয়।

সত্যিকারের ধর্ম না হিন্দু, না জৈন, না বৌদ্ধ বা ইসলাম বা খ্রিস্ট। সত্যিকারের ধর্মের কোনও নাম হয় না। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ইত্যাদি সব নামই আরোপিত নাম। আমাদের সত্যিকারের ধর্ম তো সেটাই, যেটা আমাদের নিজ স্বভাব। এইজন্য ভগবান মহাবীর "বত্থু সহাবো ধম্মো" বলে ধর্মকে

পরিভাষিত করেছেন। প্রত্যেক আত্মার যা নিজের গুণ তথা স্বভাব, সেটাই ধর্ম। কাম, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি বিকার থেকে বিমুক্ত হওয়াই সত্য ধর্ম। নিজের স্বভাব থেকে ভিন্ন যা'ই হোক সেটা তাঁর কাছে ধর্ম নয়, অধর্ম। তাই গীতায় বলা হয়েছে "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ"। পরধর্ম অর্থাৎ অন্যের স্বভাবকে এইজন্যই ভয়াবহ বলা হয়েছে যে, সেটা আমাদের জন্য স্বভাব না হয়ে বিভাব হয়ে যায়; আর, যা বিভাব সেটা ধর্ম না হয়ে অধর্মই হয়। এটা ঠিক যে আজ পৃথিবীতে অনেক ধর্ম প্রচলিত আছে। কিন্তু যদি আমরা গভীরভাবে বিচার করি, তো এই সব ধর্মেরই মূলভুত লক্ষ্য হল, মানুষ কে ভালো মানুষরূপে বিকশিত করে তাকে পরমাত্মতত্ত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শীলবান, সমাধিবান, প্রজ্ঞাবান হওয়া কি কেবল বৌদ্ধদেরই ধর্ম? বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহ হওয়া কি কেবল জৈনদেরই ধর্ম? স্থিতপ্রজ্ঞ, অনাসক্ত, জীবন্মুক্ত হওয়া কি কেবল হিন্দুরই ধর্ম? এইজন্য প্রথমে ধর্মের শুদ্ধ স্বরূপকে জানতে হবে এবং তারপর তাকে নিজ জীবনে ধারণ করতে হবে।

জিনেন্দ্র ভগবান বা জিনেশ্বরগণ স্বয়ং নিজেদের জীবনে যে ধর্ম আচরণের দ্বারা বিশ্বমানবকে ঐহিক ও পারলৌকিক বিকাশের পথ দেখিয়েছিলেন, সেটাই সাধকদের জন্য ধর্মে পরিণত হয়েছে। তীর্থঙ্কর তথা জিনগণ এই ধর্মের প্ররূপনা করেছিলেন, তাই এই ধর্মের নাম হয়েছে জিনধর্ম বা জৈনধর্ম। একথা ঠিক যে, 'জৈনধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ বেদ, ত্রিপিটক বা আগমগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় না। এই কারণে কিছু মানুষ জৈন ধর্মকে প্রাচীন বলে মেনে না নিয়ে অর্বাচীন বলে মনে করেন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। প্রাচীন সাহিত্যে জৈনধর্মের নামোল্লেখ না মেলার কারণ এটাই যে, ঐ সময় পর্যন্ত এই ধর্ম জৈনধর্ম নামে পরিচিত ছিল না। বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মের একটি হল হিন্দু ধর্ম; কিন্তু সেটিরও 'হিন্দু ধর্ম' নামে পরিচিতি শুরু হয় অনেক অনেক পরে। দশবৈকালিক, উত্তরাধ্যায়ন এবং সূত্রকৃতাঙ্গের মতো আদি আগমসাহিত্যে জিন শাসন, জিনধর্ম, জিন প্রবচন, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ আছে। ভগবান মহাবীরের শাসন প্রবর্তনের বেশ কিছুকাল পরে 'জৈনধর্ম' শব্দের প্রয়োগ শুরু হয়। এই শব্দের প্রয়োগ প্রথম করেন জিনভদ্রগণী ক্ষমাশ্রমণ তাঁর 'বিশেষাবশ্যক ভাষ্যে'। তার পর থেকে পরবর্তী সাহিত্যে 'জৈন' শব্দ ব্যাপক আকারে প্রচলিত হয়েছে।

'জৈন' শব্দের মূল উৎস জিন। √জি জয়ে ধাতু থেকে জিন শব্দ নিষ্পন্ন। এর শাব্দিক অর্থ হল জয়ী। জিন শব্দের পরিভাষা হিসাবে বলা হয়েছে, "রাগ-দ্বেষাদি দোষান্ কর্মশত্রূন্ জয়তীতি জিনঃ তস্যানুয়ায়িনো জৈনঃ"। অর্থাৎ রাগ দ্বেষ ইত্যাদি দোষ আর কর্মশত্রুদের উপর জয়লাভ করেছেন যিনি, তিনি জিন; এবং তাঁর অনুগামীদের জৈন বলা হয়।বুদ্ধের অনুগামীদের যেমন বৌদ্ধ বলা হয়, বিষ্ণুকে যাঁরা উপাস্য মানেন, তাঁদের যেমন বৈষ্ণব বলা হয়, শিবের উপাসকদের যেমন 'শৈব' বলা

হয়, তেমনই জিনের উপাসকদের জৈন বলা হয়। বিষ্ণু বা শিবের মত জিন কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। সেই সব মহান আত্মা যাঁরা রাগদ্বেষকে জয় করেছেন, জিতেন্দ্রিয় হয়েছেন, বীতরাগ হয়েছেন, তাঁদেরই 'জিন' বলা হয়। তাঁরা জিনেশ্বর, জিনেন্দ্র, বীতরাগ, পরমাত্মা, সর্বজ্ঞ, তীর্থঙ্কর, নির্গ্রন্থ, অর্হৎ ইত্যাদি নামেও অভিহিত হন।

জিন অর্থাৎ রাগ-দ্বেষকে জয় করেছেন যিনি সেই ঈশ্বরই হলেন জিনেশ্বর। আমাদের নিজেদের আসল শত্রু হল রাগ ও দ্বেষ। এরা আমাদের অন্তরেই উৎপন্ন হয়। বাহ্যিক শত্রু বলে আমরা যাদের মনে করি তাদের জন্ম এই রাগদ্বেষরূপ আভ্যন্তরীণ শত্রুগুলির কারণেই। রাগ কথার অর্থ ইষ্ট বা পছন্দের বস্তুর প্রতি মোহ এবং দ্বেষ শব্দের অর্থ অপছন্দের বস্তুর প্রতি ঘৃণা। এই দুই শত্রু সর্বদা এক সাথেই থাকে। আমাদের হৃদয়ের রাগ এবং দ্বেষই তো বাইরের ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে শত্রুতার মূল কারণ। মনে রাখতে হবে রাগ এবং দ্বেষ একই মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ। কারো প্রতি রাগের কারণেই অন্য কারো প্রতি দ্বেষ আসে। রাগ দূরীভূত হলে তাই দ্বেষ আপনাআপনিই নষ্ট হয়ে যায়। 'বীত' শব্দের অর্থ বিগত অর্থাৎ যা চলে গিয়েছে। রাগ অর্থাৎ মমত্ব ভাব। তাই, যার রাগ ইত্যাদি পাপ ভাব চলে গেছে, তাঁকে বীতরাগ বলা হয়। জিনেশ্বর প্রভু রাগকে একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলেছেন, যার ফলে রাগ তো চলে গেছেই, তার সাথে সাথে দ্বেষও চলে গেছে। এই দুটি শত্রু যাওয়ার অর্থ সব দোষ চলে গেছে, জগৎ সংসার চলে গেছে এবং ভগবান বীতরাগ হয়ে গেছেন। 'পরমাত্মা' অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মা। রাগ দ্বেষ দূর হওয়ার পর আত্মা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। তখন তাঁকে পরমাত্মা বলে।

জৈন ধর্ম মূলতঃ আত্মবাদী ধর্ম। এর সমস্ত চিন্তাভাবনা আত্মাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এতে আত্মার গুণের পূজা করা হয়, কোনও ব্যক্তির পূজা করা হয় না। কথাটা অনেকের কাছে আশ্চর্য মনে হতে পারে, কেননা আমরা ভগবান মহাবীরের, পার্শ্বনাথের বা অন্য সব তীর্থংকরদের সুন্দর সুন্দর মন্দির দেখতে পাই। সে সব মন্দিরে ভক্তরা সেই ভগবানের পূজা করেন, সেটাও চোখে পড়ে। কিন্তু এই চোখে পড়াটাই আসল সত্য নয়। একটু মন দিয়ে তাঁদের মন্ত্রগুলো শুনলেই আমরা বুঝতে পারব, আসলে তাঁরা সেই মন্ত্রগুলির মাধ্যমে জিনেন্দ্রদেবের গুণগুলিরই কীর্তন করছেন। অবশ্য জ্ঞানের প্রাথমিক স্তরে অনেকেই যে ব্যক্তি মহাবীর বা ব্যক্তি পার্শ্বের পুজোও করেন, সেকথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে। সম্ভবতঃ তা পরবর্তীকালের সামাজিক প্রভাব।

(ক্রমশঃ)

JAIN BHAWAN PUBLICATIONS

P-25, Kalakar Street, Kolkata - 700 007

English :

1. *Bhagavati-Sūtra* - Text edited with English translation by K.C. Lalwani in 4 volumes ;
   Vol - I (*Śatakas 1 - 2*) Price : Rs. 150.00
   Vol - II (*Śatakas 3 - 6*) 150.00
   Vol - III (*Śatakas 7 - 8*) 150.00
   Vol - IV (*Śatakas 9 - 11*) ISBN : 978-81-922334-0-6 150.00
2. James Burges - *The Temples of Śatruñjaya,* 1977, pp. x+82 with 45 plates Price : Rs. 100.00
   [It is the glorification of the sacred mountain *Śatruñjaya.*]
3. P.C. Samsukha -- *Essence of Jainism* ISBN : 978-81-922334-4-4
   translated by Ganesh Lalwani, Price : Rs. 15.00
4. Ganesh Lalwani - *Thus Sayeth Our Lord,* Price : Rs. 50.00
   ISBN : 978-81-922334-7-5
5. *Verses from Cidananda*
   translated by Ganesh Lalwani Price : Rs. 15.00
6. Ganesh Lalwani - *Jainthology* ISBN : 978-81-922334-2-0 Price : Rs. 100.00
7. G. Lalwani and S. R. Banerjee- *Weber's Sacred Literature of the Jains*
   ISBN : 978-81-922334-3-7 Price : Rs. 100.00
8. Prof. S. R. Banerjee - *Jainism in Different States of India*
   ISBN : 978-81-922334-5-1 Price : Rs. 100.00
9. Prof. S. R. Banerjee - *Introducing Jainism* Price : Rs. 30.00
   ISBN : 978-81-922334-6-8
10. K.C.Lalwani - *Sraman Bhagwan Mahavira* Price : Rs. 25.00
11. Smt. Lata Bothra - *The Harmony Within* Price : Rs. 100.00
12. Smt. Lata Bothra - *From Vardhamana to Mahavira* Price : Rs. 100.00
13. Smt. Lata Bothra- *An Image of Antiquity* Price : Rs. 100.00

Hindi :

1. Ganesh Lalwani - *Atimukta* (2nd edn) ISBN : 978-81-922334-1-3
   translated by Shrimati Rajkumari Begani Price : Rs. 40.00
2. Ganesh Lalwani - *Sraman Samskriti ki Kavita,*
   translated by Shrimati Rajkumari Begani Price : Rs. 20.00
3. Ganesh Lalwani - *Nīlāñjanā*
   translated by Shrimati Rajkumari Begani Price : Rs. 30.00
4. Ganesh Lalwani - *Candana-Mūrti,*
   translated by Shrimati Rajkumari Begani Price : Rs. 50.00
5. Ganesh Lalwani - *Vardhamān Mahāvīr* Price : Rs. 60.00
6. Ganesh Lalwani - *Barsat ki Ek Rāt,* Price : Rs. 45.00
7. Ganesh Lalwani - *Pañcadaśī* Price : Rs. 100.00
8. Rajkumari Begani - *Yado ke Aine me,* Price : Rs. 30.00
9. Prof. S. R. Banerjee - *Prakrit Vyākaraṇa Praveśikā* Price : Rs. 20.00
10. Smt. Lata Bothra - *Bhagavan Mahavira Aur Prajatantra* Price : Rs. 15.00
11. Smt. Lata Bothra - *Sanskriti Ka Adi Shrot, Jain Dharm* Price : Rs. 20.00
12. Smt. Lata Bothra - *Vardhamana Kaise Bane Mahāvīr* Price : Rs. 15.00
13. Smt. Lata Bothra - *Kesar Kyari Me Mahakta Jain Darshan* Price : Rs. 10.00
14. Smt. Lata Bothra - *Bharat me Jain Dharma* Price : Rs. 100.00
15. Smt. Lata Bothra - *Aadinath Risabdev Aur Austapad* Price : Rs. 250.00
    ISBN : 978-81-922334-8-2
16. Smt. Lata Bothra - *Austapad Yatra* Price : Rs. 50.00
17. Smt. Lata Bothra - *Aatm Darsan* Price : Rs. 50.00
18. Smt. Lata Bothra - *Varanbhumi Bengal* Price : Rs. 50.00
    ISBN : 978-81-922334-9-9

Bengali:

1. Ganesh Lalwani - *Atimukta* Price : Rs. 40.00
2. Ganesh Lalwani - *Sraman Sanskritir Kavita* Price : Rs. 20.00
3. Puran Chand Shyamsukha - *Bhagavān Mahāvīra O Jaina Dharma.* Price : Rs. 15.00
4. Prof. Satya Ranjan Banerjee- *Praśnottare Jaina Dharma* Price : Rs. 20.00
5. Prof. Satya Ranjan Banerjee- *Mahāvīr Kathāmrita* Price : Rs. 20.00
6. Dr. Jagat Ram Bhattacharya- *Daśavaikālika sūtra* Price : Rs. 25.00
7. Sri Yudhisthir Majhi- *Sarāk Samskriti O Purulia Purākirti* Price : Rs. 20.00
8. Dr. Abhijit Battacharya - *Aatmjayee* Price : Rs 20.00
9. Dr Anupam Jash - *Acarya Umasvati'r Tattvartha Sutra* (in press)
   ISBN : 978-93-83621-00-2

Journals on Jainism :

1. *Jain Journal* (ISSN : 0021 4043) A Peer Reviewed Research Quarterly
2. *Titthayara* (ISSN : 2277 7865) A Peer Reviewed Research Monthly
3. *Sraman* (ISSN : 0975 8550) A Peer Reviewed Research Monthly